উভয়ভারতী

স্বামী একরূপানন্দ

রত্নগর্ভা ভারতমাতার কোল আলো করে কত যে মহান ও পবিত্র সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের পবিত্র জীবনকথা অনুধ্যান করে মানুষ দেবতা হতে পারে। এমন অনেকের কথাই আমরা তেমন জানি না, যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও গৃহস্থধর্মে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এ-প্রবন্ধে এমন এক নারীর কথা আলোচনা করব যিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য শংকরকে বিদ্যাবুদ্ধিতে, প্রতিভায় অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি উভয়ভারতী—মধ্যযুগের দিক্‌পাল বেদান্তবাদী কুমারিল ভট্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের পত্নী। তাঁর চরিত্র চিরকাল অনুপ্রেরণাপ্রদ।

বিহার প্রদেশের মিথিলা নগরীতে সুবর্ণভদ্রার তটে এক ক্ষুদ্র কুটিরে বিষ্ণুমিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। একমাত্র কন্যা উভয়ভারতীকে তিনি শাস্ত্রে বিদুষী করে তোলেন। রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া উভয়ভারতী পনেরো বছর বয়সে ষড়্‌দর্শন, চার বেদ, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কাব্য আয়ত্ত করেন। একদিন তাঁদের গৃহে জটাধারী এক ব্রহ্মচারী এলেন সামগান করতে করতে। সামছন্দের সুমধুর ঝঙ্কার অন্তঃপুরে পৌঁছলে বিষ্ণুমিত্রের সহধর্মিণী মন্দা দেবী ও কন্যা উৎসুক হয়ে বাইরে এলেন। কন্যাকে দেখে ব্রহ্মচারী করুণাসিক্ত নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ''এর সন্ন্যাসযোগ আছে।'' পরে মন্দা দেবীর অনুরোধে উভয়ভারতীর হাত দেখে ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, ''এর রাজসৌভাগ্য আছে, এর পতি হবেন বিশ্বখ্যাত বিদ্বান ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু তিনি ভারতবিখ্যাত এক যতির কাছে পরাজিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।'' শুনে মাতাপিতা চিন্তিত হলে ব্রহ্মচারী আরও বললেন, ''এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী তুল্য কন্যা তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে তাতেই তোমাদের গর্ব হওয়া উচিত, দুঃখ কোরো না।''

কিছুদিন পর ঘটক গোবিন্দ উভয়ভারতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বিষ্ণুমিত্রের কাছে আসেন। পাত্র ঐশ্বর্যবান হিমমিত্রের বিদ্বান পুত্র মণ্ডন মিশ্র। বিষ্ণুমিত্র বললেন, ''আমার মতো দরিদ্রের কন্যাকে

সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তমলুক

কি হিমমিত্র তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন?" তাঁকে আশ্বস্ত করে গোবিন্দ বলেছিলেন, ''আপনার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। হিমমিত্রের ঐশ্বর্যের অভাব নেই, তাঁর প্রয়োজন সরস্বতীতুল্য পুত্রবধূ।" ঘটকের চেষ্টায় এই বিবাহ স্থির হল। বিষ্ণুমিত্র হিমমিত্রকে বলেন, ''কন্যা জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অনুমতি দিলে বিবাহের দিন ও লগ্ন সে নিজেই স্থির করতে পারবে।" এই প্রস্তাব হিমমিত্র সানন্দে গ্রহণ করলেন। শুভদিনে তাঁদের বিবাহ হল।

আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগে এক নারীর জ্যোতিষশাস্ত্রে এত অধিকার ছিল যে, সেযুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের পিতা পর্যন্ত পুত্রের বিবাহের দিন ও সময় নির্ধারণের জন্য ভাবী পুত্রবধূর উপর আস্থা রেখেছিলেন। আজও আমরা ভাবতে পারি না কন্যা নিজের বিবাহের দিন ও লগ্ন নিজেই স্থির করবেন। এ-ঘটনা প্রমাণ করে সেযুগের পণ্ডিতসমাজ নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিত, যা আজও আমরা সর্বদা নারীকে দিতে পারি না।

বিবাহের পর মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী মাহিষ্মতী নগরে ওঙ্কারনাথের কাছে নর্মদা ও মাহিষ্মতী নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে দাসদাসী পরিবৃত হয়ে সুখে বাস করছিলেন। সেটি সেকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাচর্চার স্থানে পরিণত হয়েছিল। বহু ছাত্র সেখানে অধ্যয়নের জন্য আসত। কিছুদিন পর হিমমিত্র অসুস্থ হয়ে শরীরত্যাগ করেন। মণ্ডন মিশ্র নির্দিষ্ট দিনে পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। বহু ব্রাহ্মণ, জ্ঞানীগুণীকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবা করলেন ও বহু দরিদ্রকে অকাতরে দান করলেন।

এদিকে ভারতবিখ্যাত ষোলো বছরের পণ্ডিত আচার্য শংকর যখন উত্তরকাশীতে, একদিন মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাঁকে ব্রহ্মসূত্র থেকে কিছু প্রশ্ন করেন। তাঁর শাস্ত্রে অধিকার দেখে শংকর তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় দেন। শংকর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থটি দেখে তিনি বলেছিলেন, ''অতি সুন্দর হয়েছে। এ তোমারই যোগ্য।" শংকর সমাধিতে শরীরত্যাগের অনুমতি চাইলে মহর্ষি বললেন, ''তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তুমি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের পরাজিত করে স্বমতে আনয়ন করো। তোমার আয়ু ষোলো বছর থেকে বাড়িয়ে বত্রিশ বছর করে দিলাম। এখন তোমার প্রথম কাজ হবে শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক কুমারিল ভট্টকে পরাজিত করে তাঁকে দিয়ে ভাষ্যের বার্তিক রচনা করা।"

বার্তিক রচনার অর্থ গ্রন্থের দোষগুণ নির্ণয় এবং টীকা রচনার অর্থ ব্যাখ্যা। শংকরের রচনার দোষগুণ নির্ণয়ের ক্ষমতা কুমারিল ভট্টেরই ছিল। তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব খর্ব করে বৈদিক সনাতন ধর্ম পুনঃস্থাপন করেছিলেন। জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের দোষদর্শন করে ঈশ্বর অসিদ্ধ প্রমাণ করার অপরাধে কুমারিল তখন তুষানলে প্রবেশ করে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় আচার্য শংকর এসে তাঁকে বিচারে আহ্বান করলে কুমারিল দেহত্যাগের সংকল্প ছাড়তে রাজি হলেন না। বললেন, তাঁর শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে পরাজিত করলেই তাঁকে পরাজিত করা হবে। এও জানালেন, মণ্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতী বিচারসভার মধ্যস্থতা করবেন।

আচার্য শংকর ওঙ্কারনাথে এসে মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু তখন মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ঋষি জৈমিনি ও ব্যাসদেবকে মন্ত্রবলে এনে তাঁদের সেবা করছেন। তাই তিনি কারও সঙ্গেই দেখা করতে রাজি হলেন না। আচার্য তখন যোগবলে আকাশপথে মণ্ডনের প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এলেন। এতে কর্মবাদী মণ্ডন ক্ষুব্ধ হয়ে অপরিচিত সন্ন্যাসীকে উপহাস করতে থাকেন। তাঁর অশালীন ও উদ্ধত আচরণ দেখে মহর্ষি ব্যাসদেব

বলেন, ''মণ্ডন, ইনি যতি, সুতরাং বিষ্ণুস্বরূপ, তাছাড়া অতিথি। তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান করা তোমার উচিত।'' মণ্ডন লজ্জিত হয়ে শংকরের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং বসিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। পরদিন বিচার শুরু হল। উভয়ের ইচ্ছা ছিল ব্যাসদেব ও ঋষি জৈমিনি বিচারের মধ্যস্থতা করবেন। কিন্তু উভয় ঋষিই উভয়ভারতীকে এই বিচারের মধ্যস্থ করতে বলেন। এতে আচার্য শংকর ও মণ্ডন উভয়ে সম্মত হন।

শর্ত হল, যিনি পরাজিত হবেন তিনি গ্রহণ করবেন বিজেতার মত। মণ্ডনের মত ছিল, কর্মের মাধ্যমে অনন্ত স্বর্গসুখ লাভের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়। জনকাদি রাজা সেইভাবে মুক্ত হয়েছেন। শংকরের মত, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই বেদের একমাত্র তাৎপর্য। কর্ম বা উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায় মাত্র। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল, বিচারে কেউ পরাজিত হচ্ছেন না। তখন উভয়ভারতী বললেন, ''মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, আমি স্বামীর মধ্যাহ্ন আহারের জন্য অন্নব্যঞ্জন তৈরি করব। তাই দূর থেকে আপনাদের বিচার শুনব।'' যাওয়ার পূর্বে দুজনের গলায় একটি করে মালা পরিয়ে তিনি বললেন, ''যাঁর মালা আগে মলিন হবে তিনি পরাজিত বিবেচিত হবেন।'' এইভাবে সাতদিন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিচার চলছিল। বহু দেবদেবী আকাশমার্গ থেকে সেই বিচার দেখছিলেন ও শুনছিলেন। অষ্টম দিনে উভয়ভারতী দেখলেন স্বামীর গলার মালা মলিন হতে শুরু করেছে। তিনি বুঝলেন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হলেন।

দুই দিকপাল পণ্ডিতের বিচারসভায় মধ্যস্থতা করছেন এক নারী। নিজ যোগ্যতায় উভয়ভারতী সে-আসন অলংকৃত করার অধিকারিণী হয়েছিলেন। বিচার সমাপ্ত হচ্ছে না দেখে পতিসেবাপরায়ণা উভয়ভারতী স্বামীর মধ্যাহ্ন আহার রন্ধনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ যেন যুগপরম্পরায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। মণ্ডন মিশ্র প্রভূত ঐশ্বর্যবান, উভয়ভারতীও বহু দাসদাসী পরিবৃতা ও বিদুষী, তবুও নিজহাতে তিনি স্বামীর জন্য রন্ধন করতেন। ভারতের পতিব্রতা রমণীর আদর্শ এমনই, পতিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। প্রতিমায় যদি ভগবানের পূজা হয়, তবে জীবন্ত মানুষে কেন হবে না? এছাড়া এতে পতিপত্নীর পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়, সুন্দর গার্হস্থ্যজীবন গড়ে ওঠে। দুপক্ষেই এই শ্রদ্ধা আবশ্যক।

মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হওয়ার পর উভয়ভারতী শংকরাচার্যকে বলেন, ''আমার পতির পরাজয় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। শাস্ত্রে আছে—'আত্মনোঽর্ধং পত্নী'। আগে আমাকে পরাজিত করে তারপর আমার পতিকে আপনার শিষ্য করুন।'' অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতিতে শংকর একটু মৌন থেকে পরে বললেন, ''দেবী, যশস্বী পণ্ডিতগণ কখনও নারীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন না।'' এতে অসন্তুষ্ট উভয়ভারতী বললেন, ''আপনি নারীকে কেন তুচ্ছ জ্ঞান করছেন? ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সঙ্গে, রাজর্ষি জনক সুলভার সঙ্গে বিচার করেছিলেন। আপনি আমার সঙ্গে কেন বিচার করবেন না? যদি বিচার না করেন তবে স্বীকার করুন আপনি পরাজিত।'' বাধ্য হয়ে আচার্য উভয়ভারতীর সঙ্গে বিচার শুরু করলেন। উভয়ভারতীর শত শত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলেন তিনি। বিচার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে লাগল, উভয়ভারতীর পাণ্ডিত্যের গভীরতা, বিচারভঙ্গি, বিশ্লেষণশক্তি ইত্যাদি দেখে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হলেন। এভাবে সতেরো দিন বিচারের পর আঠারো দিনের দিন উভয়ভারতী কামশাস্ত্র বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলেন, যেগুলির উত্তর সন্ন্যাসীর জানার কথা নয়। শংকর মাথা নিচু করে রইলেন, অনেকক্ষণ পরে বললেন, ''দেবী, আপনি শাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন করুন, সন্ন্যাসীকে এই জাতীয় প্রশ্ন কেন করছেন?'' উভয়ভারতী বললেন, ''কেন যতিবর? কামশাস্ত্র কি

শাস্ত্র নয়? আপনি সর্বজ্ঞ হয়েও তো দিগ্বিজয়ের বাসনা ত্যাগ করেননি! এছাড়া আপনি যদি সিদ্ধ হন তবে তো জিতেন্দ্রিয়, তাহলে কামশাস্ত্র আলোচনায় আপনার চিত্তবিকার কেন হবে?" সন্ন্যাসিবর বিব্রত হচ্ছেন দেখে স্ত্রীকে মণ্ডন মিশ্র বলেন, ''সন্ন্যাসীকে এমন প্রশ্ন করে বিব্রত করা কি ঠিক হচ্ছে?" উভয়ভারতী নির্ভীকভাবে জানালেন, ''সন্ন্যাসীর জ্ঞানলাভের ফলে কামক্রোধাদি জয় করার কথা। কামশাস্ত্র আলোচনায় যদি চিত্তবিকার হয় তবে উনি আপনার গুরু হওয়ার যোগ্য নন।" আচার্য শংকর তখন শান্তভাবে বললেন, ''মা, সন্ন্যাসীর পক্ষে কামত্যাগ—এই তো শাস্ত্রের অনুশাসন। লোকসংগ্রহের জন্য শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে হয়। আমি সন্ন্যাসীর আদর্শকে কলুষিত করব না। তাই একমাস সময় দিন, অন্যদেহে প্রবেশ করে আপনার প্রশ্নের লিখিত জবাব দেব।" উভয়ভারতী জিজ্ঞাসা করলেন, ''অন্যদেহে প্রবেশ করে কামচিন্তা করলে আপনি সন্ন্যাসধর্ম হতে চ্যুত হবেন না?" উত্তরে শংকর বলেন, ''পূর্বজন্মে চণ্ডাল পরজন্মে ব্রাহ্মণ হলে কি তার ব্রাহ্মণত্বের হানি হয়?"

এরপর শংকর এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করে কামশাস্ত্র অবগত হন এবং একমাস পর ফিরে এসে উভয়ভারতীকে লিখিত উত্তর দেন। সন্তুষ্ট উভয়ভারতী শংকরের জয় ঘোষণা করেন। মণ্ডনপত্নী বলেন, ''এখন আমার পতি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন আর আমি সমাধিতে দেহত্যাগ করব।" আচার্য শংকর নতজানু হয়ে উভয়ভারতীর চরণপ্রান্তে বসে বলেন, ''হে দেবী, আপনার জন্মরহস্য আমি জানি, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যা বিতরণের জন্য দেহধারণ করেছেন। আপনি শরীর ত্যাগ করলে পৃথিবীতে জ্ঞানের অভাব দেখা দেবে। আমার ইচ্ছা শৃঙ্গেরীতে একটি মঠ স্থাপন করি, আর সেখানে আপনি অধিষ্ঠান করে জ্ঞান বিতরণ করুন।"

উত্তরে উভয়ভারতী বলেন, ''আমি দৈবশরীরে সেই আশ্রমে অবস্থান করব। আপনি সেখানে আমার নামে যন্ত্র স্থাপিত করুন।" এরপর উভয়ভারতী সমাধিতে শরীরত্যাগ করেন। স্ত্রীর সৎকারাদি ক্রিয়া সমাধা করে মণ্ডন মিশ্র শংকরাচার্যের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নেন—তাঁর নাম হয় সুরেশ্বরাচার্য।

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সরস্বতীই পৃথিবীতে জ্ঞান বিতরণের জন্য উভয়ভারতীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মতান্তরে, তিনি দুর্বাসার শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে জন্মেছিলেন। তাঁর জীবনে দেখি লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ গৃহিণীর আচরণ। তিনি পরাজিত স্বামীর সম্মানরক্ষার জন্য অসমসাহসী হয়ে শ্রেষ্ঠ আচার্যের সঙ্গে বিচারে সম্মুখীন হতে ভয় পাননি। চোখের সামনে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত স্বামীকে পরাজিত হতে দেখেও তিনি শংকরকে বিচারে আহ্বান করলেন, কারণ পতিব্রতার কর্তব্য স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হওয়া। সেকালে এক নারী পুরুষসভায় বিচার করবে তা ছিল কল্পনাতীত। তাঁর বিচারণায় প্রবৃত্তি, বাচনভঙ্গি সবাইকে বিস্মিত করেছিল। এ তাঁর পাণ্ডিত্য ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয়। সন্ন্যাসী শংকর নারীর সঙ্গে বিচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে ইতিহাসের উদাহরণ দেখিয়ে তাঁকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস শিক্ষণীয়।

স্বামীজী চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য ভোগবাদের অনুকরণ ছেড়ে প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভারতের উন্নতি সাধন করতে। নারীজাতির উন্নতি ও ধর্মকে বাদ দিয়ে এদেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই ভারতের নবীন প্রজন্মকে এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অধিকতর পরিচয় করাতে হবে। উভয়ভারতীর মতো নারীদের জীবনই এযুগের নারীদের দেখাতে পারে নতুন দিশা, নতুন আলো, নতুন আশা।